আল মুনাফিকূন

৬৩

নামকরণ

প্রথম আয়াতের إِذَا جَاءَكَ الْمُنَٰفِقُونَ অংশ থেকে এ সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এটি এ সূরার নাম এবং এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ এ সূরায় মুনাফিকদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বনী মুসতালিক যুদ্ধাভিযান থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে অথবা মদীনায় পৌছার অব্যবহিত পরে এ সূরা নাযিল হয়েছিল। ৬ হিজরীর শা'বান মাসে বনী মুসতালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল একথা আমরা সূরা নূরের ভূমিকায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বর্ণনা করেছি। এভাবে এর নাযিল হওয়ার সময় সঠিকভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে আমরা পরে আরো আলোচনা করব।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরা নাযিল হয়েছিল তা আলোচনার পূর্বে মদীনার মুনাফিকদের ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। কারণ ঐ সময় যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা আদৌ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিল না। বরং তার পেছনে ছিল একটি পুরো ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহ যা পরিশেষে এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

পবিত্র মদীনা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'টি পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিতে প্রায় ঐকমত্যে পৌছেছিল। তারা যথারীতি তাকে বাদশাহ বানিয়ে তার অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিও শুরু করেছিল। এমন কি তার জন্য রাজ মুকুটও তৈরী করা হয়েছিল। এ ব্যক্তি ছিল খাযরাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, খাযরাজ গোত্রে তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বসম্মত এবং আওস ও খাযরাজ ইতিপূর্বে আর কখনো একযোগে এক ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪)

এই পরিস্থিতিতে ইসলামের বাণী মদীনায় পৌছে এবং এই দু'টি গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। হিজরাতের আগে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন মদীনায় আগমনের জন্য আহবান

জানানো হচ্ছিল তখন হযরত আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাদলা (রা) আনসারী এ আহবান জানাতে শুধু এ কারণে দেরী করতে চাচ্ছিলেন যাতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও বইয়াত ও দাওয়াতে শামিল হয় এবং এভাবে মদীনা যেন সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু যে প্রতিনিধি দল বাইয়াতের জন্য হাজির হয়েছিল তারা এই যুক্তি ও কৌশলকে কোন গুরুত্বই দিলেন না এবং এতে অংশগ্রহণকারী দুই গোত্রের ৭৫ ব্যক্তি সব রকম বিপদ মাথা পেতে নিয়ে নবী (সা)-কে দাওয়াত দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। (ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৯) আমরা সূরা আনফালের ভূমিকায় এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছি।

এরপর নবী (সা) যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন আনসারদের ঘরে ঘরে ইসলাম এতটা প্রসার লাভ করেছিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিরূপায় হয়ে পড়েছিল। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য তার নিজের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তাই সে তার বহু সংখ্যক সহযোগী ও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ছিল উভয় গোত্রের প্রবীণ ও নেতৃ পর্যায়ের লোকেরা। অথচ তাদের সবার অন্তর জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অন্তরজ্বালা ও দুঃখ ছিল অত্যন্ত তীব্র। কারণ সে মনে করতো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাজত্ব ও বাদশাহী ছিনিয়ে নিয়েছেন। তার এই মুনাফেকীপূর্ণ ঈমান এবং নেতৃত্ব হারানোর দুঃখ কয়েক বছর ধরে বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশ পেতে থাকল। একদিকে তার অবস্থা ছিল এই যে, প্রতি জুম'আর দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খোতবা দেয়ার জন্য মিম্বারে উঠে বসতেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উঠে বলতো, "ভাইসব, আল্লাহর রসূল আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাঁর কারণে আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তাই আপনারা সবাই তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করুন, তিনি যা বলেন গভীর মনযোগ সহকারে তা শুনুন এবং তাঁর আনুগত্য করুন।" (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১) অপরদিকে অবস্থা ছিল এই যে, প্রতিদিনই তার মুনাফেকীর মুখোশ খুলে পড়ছিল এবং সৎ ও নিষ্ঠবান মুসলমানদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল যে, সে ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ইসলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা পোষণ করে।

একবার নবী (সা) কোন এক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় পথে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁর সাথে অভদ্র আচরণ করে। তিনি হযরত সা'দ ইবনে উবাদাকে বিষয়টি জানালে সা'দ বললেন, "হে আল্লাহর রসূল, আপনি এ ব্যক্তির প্রতি একটু নম্রতা দেখান। আপনার আগমনের পূর্বে আমরা তার জন্য রাজমুকুট তৈরী করেছিলাম। এখন সে মনে করে, আপনি তার নিকট থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন।" (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৭, ২৩৮)

বদর যুদ্ধের পর বনী কাইনুকা গোত্রের ইহুদীরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অকারণে বিদ্রোহ করলে রসূলুল্লাহ (সা) তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তখন এই ব্যক্তি তাদের সমর্থনে কোমর বেঁধে কাজ শুরু করে। সে নবীর (সা) বর্ম ধরে বলতে লাগলো, এই গোত্রটির সাতশত বীরপুরুষ যোদ্ধা শত্রুর মোকাবেলায় সবসময় আমাকে সাহায্য করেছে, আজ একদিনেই আপনি তাদের হত্যা করতে চাচ্ছেন? আল্লাহর শপথ, আপনি যতক্ষণ

আমার এই মিত্রদের ক্ষমা না করবেন আমি ততক্ষণ আপনাকে ছাড়বো না। (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১—৫২)

উহুদ যুদ্ধের সময় এই ব্যক্তি খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে তার তিনশত সঙ্গী–সাথীকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসেছে। কি সাংঘাতিক নাযুক মুহূর্তে সে এই আচরণ করেছে তা এই একটি বিষয় থেকেই অনুমান করা যায় যে, কুরাইশরা তিন হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপরে চড়াও হয়েছিল আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র এক হাজার লোক নিয়ে তাদের মোকাবিলা ও প্রতিরোধের জন্য বেরিয়েছিলেন। এক হাজার লোকের মধ্যে থেকেও এই মুনাফিক তিনশত লোককে আলাদা করে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল এবং নবী (সা)–কে শুধু সাতশত লোকের একটি বাহিনী নিয়ে তিন হাজার শত্রুর মোকাবিলা করতে হলো।

এ ঘটনার পর মদীনার সব মুসলমান নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলো যে, এ লোকটি কট্টর মুনাফিক। তার যেসব সংগীসাথী এই মুনাফিকীতে তার সাথে শরীক ছিল তাদেরকেও তারা চিনে নিল। এ কারণে উহুদ যুদ্ধের পর প্রথম জুম'আর দিনে নবীর (সা) খোতবা দেয়ার পূর্বে এ ব্যক্তি যখন বক্তৃতা করতে দাঁড়ালো তখন লোকজন তার জামা টেনে ধরে বলল ঃ "তুমি বসো, তুমি একথা বলার উপযুক্ত নও।" মদীনাতে এই প্রথমবারের মত প্রকাশ্যে এ ব্যক্তিকে অপমানিত করা হলো। এতে সে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হলো এবং মানুষের ঘাড় ও মাথার ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। মসজিদের দরজার কাছে কিছু সংখ্যক আনসার তাকে বললেন, "তুমি একি আচরণ করছো? ফিরে চলো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করো।" এতে সে ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং বললো! "তাকে দিয়ে আমি কোন প্রকার ক্ষমা প্রার্থনা করাতে চাই না।" (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১)।

হিজরী ৪ সনে বনু নাযীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই সময় এই ব্যক্তি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা আরো খোলাখুলিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের সাহায্য সহযোগিতা দান করে। একদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর জান কবুল সাহাবীগণ এসব ইহুদী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। অপরদিকে এই মুনাফিকরা গোপনে গোপনে ইহুদীদের কাছে খবর পাঠাচ্ছিল যে, তোমরা রুখে দাঁড়াও। আমরা তোমাদের সাথে আছি। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই গোপন গাঁটছড়া বাঁধার বিষয়টি প্রকাশ করে দিলেন। সূরা হাশরের দ্বিতীয় রুকূ'তে এ বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু তার ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মুখোশ খুলে পড়ার পরও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কার্যকলাপ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ মুনাফিকদের একটি বড় দল তার সহযোগী ছিল। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের বহু সংখ্যক নেতা তার সাহায্যকারী ছিল। কম করে হলেও মদীনার গোটা জনবসতির এক তৃতীয়াংশ ছিল তার সাঙ্গপাঙ্গ। উহুদ যুদ্ধের সময় এ বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছিল। এই

পরিস্থিতিতে বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ শত্রুর সাথেও যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়া কোন অবস্থায়ই সমীচীন ছিল না। এ কারণে তাদের মুনাফিকী সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও নবী (সা) দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে ঈমানের দাবী অনুসারেই তাদের সাথে আচরণ করেছেন। অপরদিকে এসব লোকেরও এতটা শক্তি ও সাহস ছিল না যে, তারা প্রকাশ্যে কাফের হয়ে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করত অথবা খোলাখুলি কোন হামলাকারী শত্রুর সাথে মিলিত হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হতো। বাহ্যত তারা নিজেদের একটা মজবুত গোষ্ঠী তৈরী করে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে বহু দুর্বলতা ছিল। সূরা হাশরের ১২ থেকে ১৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে সেইসব দুর্বলতার কথাই তুলে ধরেছেন। তাই তারা মনে করতো, মুসলমান সেজে থাকার মধ্যেই তাদের কল্যাণ নিহিত। তারা মসজিদে আসত, নামায পড়তো এবং যাকাতও দিতো। তাছাড়া মুখে ঈমানের লম্বা চওড়া দাবী করতো, সত্যিকার মুসলমানের যা করার আদৌ কোন প্রয়োজন পড়তো না। নিজেদের প্রতিটি মুনাফিকী আচরণের পক্ষে হাজারটা মিথ্যা যুক্তি তাদের কাছে ছিল। এসব কাজ দ্বারা তারা নিজেদের স্বগোত্রীয় আনসারদেরকে এই মর্মে মিথ্যা আশ্বাস দিত যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাদের অনেক ক্ষতি হতো। এসব কৌশল অবলম্বন করে তারা সেসব ক্ষতি থেকে নিজেদের রক্ষা করছিল। তাছাড়া তাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থেকে মুসলমানদের ভেতরে কলহ কোন্দল ও ফাসাদ সৃষ্টির এমন সব সুযোগও তারা কাজে লাগাচ্ছিল যা অন্য কোন জায়গায় থেকে লাভ করতে পারত না।

এসব কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বনী মুসতালিক যুদ্ধাভিযানে শরীক হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল এবং এই সুযোগে একই সাথে এমন দু'টি মহাফিতনা সৃষ্টি করেছিল যা মুসলমানদের সংহতি ও ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারত। কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সাহচর্য থেকে ঈমানদারগণ যে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তার কল্যাণে যথা সময়ে এ ফিতনার মূল্যোৎপাটন হয়ে যায় এবং এসব মুনাফিক নিজেরাই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। এ দু'টি ফিতনার মধ্যে একটির উল্লেখ করা হয়েছে সূরা নূরে। আর অপর ফিতনাটির উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য এই সূরাটিতে।

বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, আবদুর রায্যাক, ইবনে জারীর, তাবারী, ইবনে সা'দ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বহ সংখ্যক সনদসূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। যে অভিযানের সময় এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াতে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে তাবুক যুদ্ধের সময়কার ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মাগাযী (যুদ্ধ বিষয়ক ইতিহাস) ও সীরাত (নবী জীবন) বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ঘটনা বনী মুসতালিক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়াত একত্রিত করলে ঘটনার যে বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ

বনী মুসতালিক গোত্রকে পরাস্ত করার পর ইসলামী সেনাবাহিনী তখনও মুরাইসী নামক কূপের আশেপাশের জনবসতিতে অবস্থান করছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ পানি নিয়ে দুই

ব্যক্তির মধ্যে বচসা হয়। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল জাহ্জাহ্ ইবনে মাসউদ গিফারী। তিনি ছিলেন হযরত উমরের (রা) কর্মচারী। তিনি তাঁর ঘোড়ার দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করতেন। অন্যজন ছিলেন সিনান ইবনে ওয়াবার আল জুহানী।[১] তাঁর গোত্র খাযরাজ গোত্রের মিত্র ছিল। মৌখিক বাদানুবাদ শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে পরিণত হয় এবং জাহ্জাহ্ সিনানকে একটি লাথি মারে। প্রাচীন ইয়ামনী ঐতিহ্য অনুসারে আনসারগণ এ ধরনের আচরণকে অত্যন্ত অপমানজনক ও লাঞ্ছনাকর মনে করতেন। এতে সিনান সাহায্যের জন্য আনসারদেরকে আহবান জানায় এবং জাহ্জাহও মুহাজিরদের আহবান জানায়। এই ঝগড়ার খবর শোনামাত্র আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের উত্তেজিত করতে শুরু করে। সে চিৎকার করে বলতে থাকে দ্রুত এসো, নিজের মিত্রদের সাহায্য করো। অপরদিক থেকে কিছু সংখ্যক মুজাহিরও এগিয়ে আসেন। বিষয়টি আরো অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে পারতো। ফলে আনসার ও মুহাজিরগণ সম্মিলিতভাবে সবেমাত্র যে স্থানটিতে এক দুশমন গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের পরাজিত করেছিলেন এবং তখনও তাদের এলাকাতেই অবস্থান করছিলেন সে স্থানটিতেই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু শোরগোল শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

ما بال دعوى الجاهلية ؟ مالكم ولدعوة الجاهلية ؟ دعوها فانها منتنة –

"কি ব্যাপার! জাহেলিয়াতের আহবান শুনতে পাচ্ছি কেন? জাহেলিয়াতের আহবানের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? এসব ছেড়ে দাও, এগুলো দুর্গন্ধময় নোংরা জিনিস।[২] এতে উভয়পক্ষের সৎ ও নেক্কার লোকজন অগ্রসর হয়ে ব্যাপারটি মিটমাট করে দিলেন এবং সিনান জাহ্জাহকে মাফ করে আপোষ করে নিলেন।

১. বিভিন্ন রেওয়ায়াতে উভয়ের বিভিন্ন নাম বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা ইবনে হিশামের বর্ণনা থেকে এ নাম গ্রহণ করেছি।

২. এই সময় নবীর (সা) বলা একথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সঠিক মর্মবাণীকে বুঝতে হলে একথাটি যথাযথভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। ইসলামের নীতি হচ্ছে, দুই ব্যক্তি যদি তাদের বিবাদের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য মানুষকে আহবান জানাতে চায় তাহলে সে বলবে, মুসলমান ভাইয়েরা, এগিয়ে এসো, আমাদের সাহায্য করো। অথবা বলবে, হে লোকেরা, আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আস। কিন্তু তাদের প্রত্যেকে যদি নিজ গোত্র, স্বজন, বংশ ও বর্ণ অথবা অঞ্চলের নাম নিয়ে আহবান জানায় তাহলে তা জাহেলিয়াতের আহবান হয়ে দাঁড়ায়। এ আহবানে সাড়া দিয়ে আগমনকারী যদি কে অত্যাচারী আর কে অত্যাচারিত তা না দেখে এবং হক ও ইনসাফের ভিত্তিতে অত্যাচারিতকে সাহায্য করার পরিবর্তে নিজ নিজ গোষ্ঠীর লোককে সাহায্য করার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহলে তা একটি জাহেলিয়াতপূর্ণ কাজ। এ ধরনের কাজ দ্বারা দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে নোংরা ও ঘৃণিত জিনিস বলে আখ্যায়িত করে মুসলমানদের বলেছেন যে, এরূপ জাহেলিয়াতের আহবানের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? তোমরা ইসলামের ভিত্তিতে একটি জাতি হয়েছিলে। এখন আনসার ও মুজাহিরদের নাম দিয়ে তোমাদের কি করে আহবান জানানো হচ্ছে, আর সেই আহবান শুনে তোমরা কোথায় ছুটে যাচ্ছ? আল্লামা সুহাইলী

কিন্তু যাদের অন্তরে মুনাফিকী ছিল তারা সবাই এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে সমবেত হয়ে তাকে বললো ঃ "এতদিন আমরা তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তুমি প্রতিরোধও করে আসছিলে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে এসব কাঙাল ও নিস্বদের[১] সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছো।" আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আগে থেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। একথা শুনে সে আরো জ্বলে উঠল। সে বলতে শুরু করল ঃ এসব তোমাদের নিজেদেরই কাজের ফল। তোমরা এসব লোককে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়েছো, নিজেদের অর্থ–সম্পদ তাদের বন্টন করে দিয়েছো। এখন তারা ফুলেফেঁপে উঠেছে এবং আমাদেরই প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এবং কুরাইশদের এই কাঙালদের বা মুহাম্মাদের (সা) (সঙ্গীসাথীদের) অবস্থা বুঝাতে একটি উপমা হুবহু প্রযোজ্য। উপমাটি হলো, তুমি নিজের কুকুরকে খাইয়েদাইয়ে মোটা তাজা করো, যাতে তা একদিন তোমাকেই ছিঁড়ে ফেড়ে খেতে পারে। তোমরা যদি তাদের থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নাও তাহলে তারা কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ, মদীনা ফিরে গিয়ে আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান লোক তারা হীন ও লাঞ্ছিত লোকদের বের করে দেবে।"

এ বৈঠকে ঘটনাক্রমে হযরত যায়েদ ইবনে আরকামও উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি একজন কম বয়স্ক বালক ছিলেন। এসব কথা শোনার পর তিনি তাঁর চাচার কাছে তা বলে দেন। তাঁর চাচা ছিলেন আনসারদের একজন নেতা। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে সব বলে দেন। নবী (সা) যায়েদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি যা শুনেছিলেন তা আদ্যপান্ত খুলে বললেন।[২] নবী (সা) বললেন ঃ তুমি বোধ হয় ইবনে উবাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট। সম্ভবত তোমার শুনতে ভুল হয়েছে। ইবনে উবাই একথা বলছে বলে হয়তো তোমার সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু যায়েদ বললেন, হে আল্লাহর রসূল, তা নয়। আল্লাহর শপথ আমি নিজে তাকে এসব কথা বলতে শুনেছি। অতপর নবী (সা) ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে সরাসরি অস্বীকার করলো। সে বারবারের

"রাওদুল উনুফ" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ কোন ঝগড়া–বিবাদ বা মতানৈক্যের ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতপূর্ণ আহবান জানানোকে ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ রীতিমত ফৌজদারী অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছেন। একদল আইনবিদের মতে এর শাস্তি পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত এবং আরেক দলের মতে দশটি। তৃতীয় আরেক দলের মতে, তাকে অবস্থার আলোকে শাস্তি দেয়া দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু তিরস্কার ও শাসানিই যথেষ্ট। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের আহবান উচ্চারণকারীকে বন্দী করা উচিত। সে যদি বেশী দুষ্কর্মশীল হয় তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে।

১. যারা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে আসছিল মদীনার মুনাফিকরা তাদের সবাইকে 'جلابيب' বলে আখ্যায়িত করতো। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কম্বল বা মোটা বস্ত্র পরিধানকারী। কিন্তু গরীব মুহাজিরদেরকে হেয় ও অবজ্ঞা করার জন্যই তারা এ শব্দটি ব্যবহার করতো। যে অর্থ বুঝাতে তারা শব্দটি বলত 'কাঙাল' শব্দ দ্বারা তা অধিকতর বিশুদ্ধভাবে ব্যক্ত হয়।

২. এ ঘটনা থেকে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ধর্মীয়, নৈতিক ও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কেউ যদি কারো ক্ষতিকর কথা অন্য কারো কাছে বলে তা হলে চোখলখুরীর পর্যায়ে পড়ে না। ফিতনা–ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে যে চোখলখুরী করা হয় সেই চোখলখুরীকে ইসলামী শরীয়াত হারাম ঘোষণা করেছে।

শপথ করে বলতে লাগলো, আমি একথা কখনো বলি নাই। আনসারদের লোকজনও বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী, এতো একজন ছেলে মানুষের কথা, হয়তো তার ভুল হয়েছে। তিনি আমাদের নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি। তার কথার চেয়ে একজন বালকের কথার প্রতি বেশী আস্থাশীল হবেন না। বিভিন্ন গোত্রের প্রবীণ ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও যায়েদকে তিরস্কার করলো। বেচারা যায়েদ এতে দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ন হয়ে নিজের জায়গায় চুপচাপ বসে থাকলেন। কিন্তু নবী (সা) যায়েদ ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উভয়কেই জানতেন। তাই প্রকৃত ব্যাপার কি তা তিনি ঠিকই উপলব্ধি করতে পারলেন।

হযরত 'উমর এ বিষয়টি জানতে পেরে নবীর (সা) কাছে এসে বললেন ঃ "আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। অথবা এরূপ অনুমতি দেয়া যদি সমীচীন মনে না করেন তাহলে আনসারদের নিজেদের মধ্যে থেকে মুআয ইবনে জাবাল অথবা আববাদ ইবনে বিশর, অথবা সা'দ ইবনে মু'আয, অথবা মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে নির্দেশ দিন[১] সে তাকে হত্যা করুক।" কিন্তু নবী (সা) বললেন ঃ "এ কাজ করো না। লোকে বলবে, মুহাম্মাদ (সা) নিজের সংগী–সাথীদেরকেই হত্যা করছে।" এরপর নবী (সা) তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বাভাবিক রীতি ও অভ্যাস অনুসারে তা যাত্রার সময় ছিল না। ক্রমাগত ৩০ ঘন্টা পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত থাকলো। এমন কি লোকজন ক্লান্তিতে নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়লো। তখন তিনি একস্থানে তাঁবু করে অবস্থান করলেন। ক্লান্ত শ্রান্ত লোকজন মাটিতে পিঠ ঠেকানো মাত্র সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এ কাজ তিনি এ জন্য করলেন যাতে, মুরাইসী কূপের পাশে যে ঘটনা ঘটেছিল মানুষের মন–মগজ থেকে তা মুছে যায়। পথিমধ্যে আনসারদের একজন নেতা হযরত উসাইদ ইবনে হুদায়ের তাঁর কাছে গিয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল, আজ আপনি এমন সময় যাত্রার নির্দেশ দিয়েছেন যা সফরের জন্য উপযুক্ত নয়। আপনি তো এ রকম সময়ে কখনো সফর শুরু করতেন না?" নবী (সা) বললেন ঃ তোমাদের সেই লোকটি কি কথা প্রচার করেছে তাকি তুমি শোন নাই? তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোন লোকটি? তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। উসাইদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে কি বলেছে? তিনি বললেন ঃ "সে বলেছে, মদীনায় পৌঁছার পর সম্মানী লোকেরা হীন ও নীচ লোকদের বহিষ্কার করবে। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল। সম্মানিত ও মর্যাদাবান তো আপনি। আর হীন ও নীচ তো সে নিজে। আপনি যখন ইচ্ছা তাকে বহিষ্কার করতে পারেন।"

কথাটা আস্তে আস্তে আনসারদের সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং ইবনে উবাইয়ের বিরুদ্ধে তাদের মনে ভীষণ ক্রোধের সৃষ্টি হলো। লোকজন ইবনে উবাইকে বললো, তুমি গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ক্ষমা চাও। কিন্তু সে ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল ঃ তোমরা বললে তার প্রতি ঈমান আন। আমি ঈমান আনলাম। তোমরা বললে, অর্থ–সম্পদের যাকাত দাও। আমি যাকাতও দিয়ে দিলাম। এখন তো শুধু মুহাম্মাদকে

১ বিভিন্ন রেওয়ায়াতে আনসারদের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখিত হয়েছে। হযরত উমর (রা) নবীর (সা) কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন "আমি মুহাজির হওয়ার কারণে আমার হাতে সে নিহত হলে ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকলে এসব লোকদের মধ্য থেকে কোন একজনকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নিন।"

আমার সিজদা করা বাকী আছে। এসব কথা শুনে তার প্রতি ঈমানদার আনসারদের অসন্তুষ্টি আরো বৃদ্ধি পেল এবং চারদিক থেকে তার প্রতি ধিক্কার ও তিরস্কার বর্ষিত হতে থাকলো। যে সময় এ কাফেলা মদীনায় প্রবেশ করছিল তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র (তার নামও) আবদুল্লাহ খোলা তরবারি হাতে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ "আপনিই তো বলেছেন, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানিত ব্যক্তিরা হীন ও নীচ লোকদের সেখান থেকে বহিষ্কার করবে। এখন আপনি জানতে পারবেন সম্মান আপনার, না আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের। আল্লাহর কসম। যতক্ষণ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না।" এতে ইবনে উবাই চিৎকার করে বলে উঠল "হে খাযরাজ গোত্রের লোকজন, দেখো, আমার নিজের ছেলেই আমাকে মদীনায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে।" লোকজন গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দিলে তিনি বললেন ঃ "আব্দুল্লাহকে গিয়ে বলো, তার পিতাকে যেন নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেয়।" তখন আবদুল্লাহ বললেন ঃ "নবী (সা) অনুমতি দিয়েছেন তাই এখন আপনি প্রবেশ করতে পারেন।" এই সময় নবী (সা) হযরত উমরকে (রা) বললেন ঃ "হে উমর, এখন তোমার মতামত কি? যে সময় তুমি বলেছিলে, আমাকে তাকে হত্যা করার অনুমতি দিন, সে সময় তুমি যদি তাকে হত্যা করতে তাহলে অনেকেই নাক সিটকাতো এবং নানা রকম কথা বলতো। কিন্তু আজ যদি আমি তার হত্যার আদেশ দেই তাহলে তাকে হত্যা পর্যন্ত করা যেতে পারে।" হযরত উমর বললেন ঃ "আল্লহর শপথ, এখন আমি বুঝতে পেরেছি আল্লাহর রসূলের কথা আমার কথার চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল।"[১] এই পরিস্থিতি ও পটভূমিতে অভিযান শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় পৌঁছার পর এ সূরাটি নাযিল হয়।

---

১. এ থেকে শরীয়াতের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা যায়। এক, ইবনে উবাই যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছিল এবং যে ধরনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল মুসলিম মিল্লাতের অন্তরভুক্ত থেকে কেউ যদি এ ধরনে আচরণ করে তাহলে সে হত্যাযোগ্য অপরাধী। দুই, শুধু আইনের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি হত্যার উপযুক্ত হলেই যে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে তা জরুরী নয়। এরূপ কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে দেখতে হবে, তাকে হত্যা করার ফলে কোন বড় ধরনের ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে কিনা। পরিবেশ-পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে অন্ধভাবে আইনের প্রয়োগ কোন কোন সময় আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ফলাফল নিয়ে আসে। যদি একজন মুনাফিক ও ফিতনাবাজের পেছনে কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি থাকে তাহলে তাকে শাস্তি দিয়ে আরো বেশী ফিতনাকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ দেয়ার চেয়ে উত্তম হচ্ছে, যে রাজনৈতিক শক্তির জোরে সে দুষ্কর্ম করছে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তার মূল্যোৎপাটন করা। এই সুদূর প্রসারী লক্ষেই নবী (সা) তখনো আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে শাস্তি দেননি যখন তিনি তাকে শাস্তি দিতে সক্ষম ছিলেন। বরং তার সাথে সবসময় নম্র আচরণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত দুই তিন বছরের মধ্যেই মদীনায় মুনাফিকদের শক্তি চিরদিনের জন্য নির্মূল হয়ে গেল।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ① اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ② ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ③

হে নবী, এ মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন, তুমি অবশ্যই তাঁর রসূল। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।[১] তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে।[২] এভাবে তারা নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকছে এবং অন্যদেরও বিরত রাখছে।[৩] এরা যা করছে তা কত মন্দ কাজ! এ সবের কারণ এই যে, তারা ঈমান আনার পর আবার কুফরী করেছে। তাই তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। এখন তারা কিছুই বুঝে না।[৪]

১. অর্থাৎ যে কথা তারা মুখে বলছে তা আসলে সত্য। কিন্তু তারা মুখে যা প্রকাশ করছে নিজেরা যেহেতু তা বিশ্বাস করে না, তাই তাঁর রসূল হওয়ার যে সাক্ষ্য তারা দেয় সে ব্যাপারে তারা মিথ্যাবাদী। এখানে একথাটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, দু'টি জিনিসের সমন্বয়ের নাম সাক্ষ। এক, যে মূল বিষয়টির সাক্ষ দেয়া হয় সেটি। দুই, সেই বিষয়টি সম্পর্কে সাক্ষদানকারীর বিশ্বাস। এখন বিষয়টি যদি আসলে সত্য হয় এবং সাক্ষ দানকারী মুখে যা বলছে তার বিশ্বাসও যদি তাই হয়, তাহলে সে সবদিক দিয়েই সত্যবাদী হবে। আর বিষয়টা যদি মিথ্যা হয়, কিন্তু সাক্ষদাতা সেটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তাহলে একদিক দিয়ে আমরা তাকে সত্যবাদী বলবো। কেননা, সে তার বিশ্বাসকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সত্যবাদী। কিন্তু আরেক দিক দিয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলব। কেননা, সে যে বিষয়ের সাক্ষ দিচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে ভুল। অপরদিকে বিষয়টি যদি সত্য হয় কিন্তু সাক্ষদাতার বিশ্বাস তার পরিপন্থী হয় তাহলে সঠিক বিষয়টির সাক্ষ দেয়ার কারণে আমরা তাকে সত্যবাদী বলব। কিন্তু সে মুখে যা প্রকাশ করছে তার বিশ্বাস তা না হওয়ার কারণে

আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলব। যেমন কোন ঈমানদার ব্যক্তি যদি ইসলামকে সত্য বলে তাহলে সে সবদিক দিয়ে সত্যবাদী। কিন্তু একজন ইহুদী যদি ইহুদী ধর্মের ওপর বিশ্বাসী থেকে ইসলামকে সত্য বলে তাহলে তার কথা সত্য কিন্তু তার সাক্ষ মিথ্যা বলে গণ্য করা হবে। কেননা, সে তার বিশ্বাসের পরিপন্থী সাক্ষ দিচ্ছে। আর সে যদি ইসলামকে বাতিল বা মিথ্যা বলে তাহলে আমরা তার একথাকে মিথ্যা বলবো। কিন্তু সে যে সাক্ষ দিচ্ছে তা তার নিজের বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

২. অর্থাৎ নিজেরা মুসলমান ও ঈমানদার এ কথা বিশ্বাস করানোর জন্য তারা যেসব শপথ করে সেগুলোকে তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যাতে মুসলমানদের ক্রোধ থেকে রক্ষা পায় এবং প্রকাশ্য শত্রুর সাথে মুসলমানগণ যে আচরণ করে থাকে তাদের সাথে তা করতে না পারে।

এসব শপথ দ্বারা ঐ সব শপথও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে যা সাধারণত তারা নিজেদের ঈমানের বিষয়টি বিশ্বাস করানোর জন্য করতো। তাদের মুনাফিকী আচরণ ধরা পড়ার পর যেসব শপথ করে তারা মুসলমানদের বুঝাতে চাইতো যে, তা তারা মুনাফিকীর কারণে করেনি সেসব শপথও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আবার যায়েদ ইবনে আরকামের দেয়া খবর মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যে শপথ করেছিল তাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। এসব সম্ভাবনার সাথে আরো একটি সম্ভাবনা আছে। তা হলো, "আমরা সাক্ষ দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রসূল" তাদের এ কথাটিকে আল্লাহ তা'আলা শপথ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই সম্ভাবনার ভিত্তিতে ফিকাহবিদদের মধ্যে একটি বিষয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি "আমি সাক্ষ দিচ্ছি" বলে কোন কথা বর্ণনা করে তাহলে তা শপথ বা হলফ (Oath) বলে বিবেচিত হবে কিনা। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সঙ্গীগণ (ইমাম যুফার ছাড়া) এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আওযায়ী একে শপথ (শরীয়াতের পরিভাষা ইয়ামীন) বলে মনে করেন। ইমাম যুফার বলেন ঃ এটা শপথ নয়। ইমাম মালেক থেকে দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে, একটি হচ্ছে, এটা নিছক শপথ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, "সাক্ষ দিচ্ছি" বলার সময় সে যদি এরূপ নিয়ত করে যে, "আল্লাহর শপথ আমি সাক্ষ দিচ্ছি" অথবা "আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি" তাহলে সে ক্ষেত্রে এটা শপথমূলক বর্ণনা হবে। অন্যথায় হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বক্তব্য পেশকারী ব্যক্তি যদি এ কথাও বলে যে, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে সাক্ষ দিচ্ছি" তবুও তা তার শপথমূলক বক্তব্য বলে গণ্য হবে না। কিন্তু সে যদি এরূপ কথা শপথের নিয়তেই বলে থাকে তাহলে তা শপথ বলে গণ্য হবে। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)।

৩. আরবী ভাষায় صد শব্দটি সকর্মক এবং অকর্মক এই উভয় প্রকার ক্রিয়া হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এ কারণে صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ আয়াতাংশের অর্থ "তারা নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকে" যেমন হয়, তেমনি "তারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে"ও হয়। তাই অনুবাদে আমরা দু'টি অর্থই উল্লেখ করেছি। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতাংশের অর্থ হবে এসব শপথের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করে নেয়ার পর ঈমানের দাবী পূরণ না করার এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য থেকে পাশ কাটিয়ে চলার ব্যাপারে সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়।

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ④

তুমি যখন এদের প্রতি তাকিয়ে দেখ, তখন তাদের দেহাবয়ব তোমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়। আর যখন কথা বলে তখন তাদের কথা তোমার শুনতেই ইচ্ছা করে।[৫] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রাখা কাঠের গুড়ির মত।[৬] যে কোন জোরদার আওয়াজকে এরা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।[৭] এরাই কট্টর দুশমন।[৮] এদের ব্যাপারে সাবধান থাক।[৯] এদের ওপর আল্লাহর গযব।[১০] এদেরকে উল্টো কোন্‌দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?[১১]

দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতাংশের অর্থ হবে, এসব মিথ্যা শপথের আড়ালে তারা শিকারের সন্ধানে থাকে, মুসলমান সেজে থেকে ভিতর থেকেই মুসলমানদের জামায়াতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। মুসলমানদের গোপনীয় বিষয়সমূহ জেনে নিয়ে তা শত্রুদের জানিয়ে দেয়, ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের মধ্যে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে এবং সহজ সরল মুসলমানদের মনে সন্দেহ–সংশয় ও দ্বিধা–দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে তারা এমন সব কৌশল অবলম্বন করে যা কেবল মুসলমান সেজে থাকা একজন মুনাফিকের পক্ষেই সম্ভব। ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুরা ঐ সব কৌশল কাজে লাগাতে পারে না।

৪. এ আয়াতে ঈমান আনার অর্থ বুঝানো হয়েছে ঈমানের স্বীকৃতি দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে শামিল হওয়াকে আর কুফরের অর্থ বুঝানো হয়েছে আন্তরিকভাবে ঈমান না আনা এবং মৌখিকভাবে ঈমান আনার পূর্বে যে কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাকে। কথাটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, তারা যখন খুব ভালভাবে বুঝে শুনে সোজাসুজি ঈমানের পথ অবলম্বন অথবা পরিষ্কারভাবে কুফরের পথ গ্রহণের পরিবর্তে মুনাফিকীর এই নীতি ও পন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের অন্তরের ওপর মোহর মেরে দেয়া হলো এবং একজন সত্যবাদী, নিষ্কলুষ, সৎ ও ভদ্র মানুষের মত নীতি ও পন্থা অবলম্বন করার সামর্থ ও শুভবুদ্ধিই আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিলেন। এখন তাদের জ্ঞান ও উপলব্ধির যোগ্যতাই হারিয়ে গিয়েছে এবং নৈতিক অনুভূতির মৃত্যু ঘটেছে। রাতদিনের এই মিথ্যা, প্রতি মুহূর্তের এই প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি এবং কথা ও কাজের এই স্থায়ী বৈপরীত্য—যার মধ্যে তারা নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে—তা যে কত হীন ও লাঞ্ছনাকর অবস্থা, সে উপলব্ধিটুকু পর্যন্ত এখন তাদের আসে না।

আল্লাহর পক্ষ থেকে কারো অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার অর্থ কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি তার একটি। এসব মুনাফিকের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দেয়ার কারণে ঈমান তাদের অন্তরে

প্রবেশ করতে পারেনি এবং তারা বাধ্য হয়ে মুনাফিক রয়ে গিয়েছে—ব্যাপারটি তা নয়। বরং বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করা সত্ত্বেও যখন তারা কুফরির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। এ সময়ই তাদের থেকে নির্ভেজাল ঈমান ও তা থেকে জন্মলাভকারী নৈতিক আচরণ করার সামর্থ ও শুভবুদ্ধি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের জন্য যে মুনাফিকী ও মুনাফিকী চরিত্র পছন্দ করেছিল তার সামর্থ ও বুদ্ধিই তাদের দান করা হয়েছে।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অত্যন্ত সুঠাম দেহী, সুস্থ, সুদর্শন ও বাকপটু ব্যক্তি ছিল। তার সাঙ্গপাঙ্গদের অনেকেও তাই ছিল। এরা সবাই ছিল মদীনার নেতৃস্থানীয় লোক। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে যখন আসতো তখন দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসতো এবং রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা বলতো। তাদের দেহাবয়ব ও চেহারা–আকৃতি দেখে আর কথাবার্তা শুনে কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, সমাজের এসব সম্মানিত লোকেরা চরিত্রের দিক দিয়ে এত নীচ ও জঘন্য হতে পারে।

৬. অর্থাৎ এরা যারা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে তারা মানুষ নয়, বরং কাঠের গুড়ি। তাদেরকে কাষ্ঠখণ্ডের সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, নৈতিক চরিত্র মানুষের মূল প্রাণসত্তা, সেই প্রাণসত্তাই তাদের মধ্যে নেই। তারপর তাদেরকে দেয়ালগাত্রে হেলান দিয়ে খাড়া করা কাষ্ঠখণ্ডের সাথে তুলনা করে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তা একেবারেই অকেজো, অপদার্থ। কেননা, কাঠ কেবল তখনই উপকারে আসে যদি তা ছাদে অথবা দরজায় বা আসবাব তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। দেয়াল গাত্রে হেলান দিয়ে রাখা কাষ্ঠখণ্ড কোন উপকারেই আসে না।

৭. ছোট্ট এই আয়াতাংশে তাদের অপরাধী বিবেকের চিত্র অংকন করা হয়েছে। ঈমানের বাহ্যিক পর্দার আড়ালে মুনাফিকীর যে খেলা তারা খেলছিল তা নিজেরা যেহেতু ভাল করেই জানতো, তাই সবসময় তারা ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো যে কখন যেন তাদের অপরাধের গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যায়, অথবা তাদের আচরণের ব্যাপারে ঈমানদারদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়। জনপদের কোন স্থান থেকে কোন বড় আওয়াজ শোনা গেলে অথবা কোথাও কোন শোরগোল উত্থিত হলে তারা ভয়ে জড়ষড় হয়ে যেত এবং মনে করত, আমার দুর্ভাগ্য বোধ হয় এসেই পড়ল।

৮. অন্য কথায় প্রকাশ্য দুশমনের তুলনায় ছদ্মবেশী এসব দুশমন অনেক বেশী ভয়ংকর।

৯. অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক চালচলন ও আচার আচরণ দেখে প্রতারিত হয়ো না। এ ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকো যে, এরা যে কোন সময় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

১০. এটা বদদোয়া নয়, বরং তারা যে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং সে গযব যে অবশ্যই নাযিল হবে—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তারই ঘোষণা। এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এ বাক্যাংশটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেননি বরং আরবী বাকরীতি অনুসারে, অভিশাপ ও তিরস্কার অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমাদের নিজস্ব ভাষায় আমরা যেমন বলি ঃ ওর সর্বনাশ হোক, কি জঘন্য মানুষ সে। এখানে "সর্বনাশ" শব্দটি দ্বারা তার জঘন্যতার তীব্রতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, বদদোয়া করা নয়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾

যখন তাদের বলা হয়, এসো আল্লাহর রসূল যাতে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন তখন তারা মাথা ঝাঁকুনি দেয় আর তুমি দেখবে যে, তারা অহমিকা ভরে আসতে বিরত থাকে।[১২] হে নবী, তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর বা না কর, উভয় অবস্থাই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কখনো তাদের মাফ করবেন না।[১৩] আল্লাহ ফাসিকদের কখনো হিদায়াত দান করেন না।[১৪]

১১. তাদেরকে ঈমানের পথ থেকে মুনাফিকীর পথে কে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা বলা হয়নি। একথাটি স্পষ্ট করে না বলার কারণে আপনা থেকেই যে অর্থ প্রকাশ পায় তা হলো, তাদের এই এলোপাতাড়ি ও অস্বাভাবিক আচরণের চালিকাশক্তি একটি নয়, বরং বহু সংখ্যক চালিকাশক্তি এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে। তাদের পেছনে এই চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে শয়তান, অসৎ বন্ধু–বান্ধব এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির আকাংখাসমূহ। কারো স্ত্রী, কারো সন্তান–সন্তুতি, কারো নিজ গোত্র ও গোষ্ঠীর অসৎলোকজন তাকে এ পথে চলতে বাধ্য করছে। আবার কাউকে তার হিংসা, বিদ্বেষ ও অহমিকা এ পথে তাড়িত করেছে।

১২. অর্থাৎ তারা ইসতিগফারের জন্য রসূলের কাছে আসে না শুধু তাই নয়, বরং এ কথা শুনে অহংকার ও গর্ব ভরে মাথা ঝাঁকুনি দেয়। রসূলের কাছে আসা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করাকে নিজেদের জন্য অপমানজনক ও মর্যাদাহানিকর মনে করে আপন অবস্থানে অনড় থাকে। তারা যে ঈমানদার নয় এটা তার স্পষ্ট প্রমাণ।

১৩. একথাটি সূরা তাওবাতে (যা সূরা মুনাফিকূনের তিন বছর পর নাযিল হয়) আরো অধিক জোর দিয়ে বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না করো, এমনকি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ কখনো তাদেরকে মাফ করবেন না। কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আল্লাহ ফাসিকদের হিদায়াত দান করেন না।" (আত তাওবা, আয়াত ৮০) পরে আরো বলা হয়েছে ঃ তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। এরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসেক অবস্থায় মারা গেছে। (আত তাওবা, আয়াত ৮৪)

১৪. এ আয়াতটিতে দু'টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এক, মাগফিরাতের জন্য দোয়া শুধু হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের জন্যই ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর হতে পারে। যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথ থেকে সরে গিয়েছে এবং যে ব্যক্তি আনুগত্যের পরিবর্তে গোনাহ ও

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝٧ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝٨

এরাই তো সেই সব লোক যারা বলে, আল্লাহর রসূলের সাথীদের জন্য খরচ করা বন্ধ করে দাও যাতে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ আসমান ও যমীনের সমস্ত ধন ভাণ্ডারের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু এই মুনাফিকরা তা বুঝে না। এরা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারলে যে সম্মানিত সে হীন ও নীচদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে।[১৫] অথচ সম্মান ও মর্যাদা তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের জন্য।[১৬] কিন্তু এসব মুনাফিক তা জানে না।

অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করেছে তার জন্য কোন সাধারণ মানুষের দোয়া তো দূরের কথা আল্লাহর রসূল নিজেও যদি তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন তবুও তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে না। দুই, যারা আল্লাহর হিদায়াত পেতে আগ্রহী নয় তাদের হিদায়াত দান করা আল্লাহর নীতি নয়। কোন ব্যক্তি নিজেই যদি আল্লাহর হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে বরং তাকে হিদায়াতের দিকে আহবান জানালে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে অহংকার ভরে সে আহবান প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আল্লাহর কি প্রয়োজন পড়েছে যে, তার পিছনে পিছনে নিজের হিদায়াতের ফেরি করে বেড়াবেন এবং তোষামোদ করে তাকে সত্যপথে নিয়ে আসবেন।

১৫. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম বলেন ঃ আমি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এ কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম এবং সে এসে শপথ করে পরিষ্কার ভাষায় তা অস্বীকার করলো তখন আনসারদের প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ লোকজন এবং আমার আপন চাচা আমাকে অনেক তিরস্কার করলেন। এমনকি আমার মনে হলো নবীও (সা) আমাকে মিথ্যাবাদী এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে সত্যবাদী মনে করেছেন। এতে আমার এত দুঃখ ও মনঃকষ্ট হলো যা সারা জীবনে কখনো হয়নি। আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে নিজের জায়গায় বসে পড়লাম। পরে এ আয়াতগুলো নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডেকে হাসতে হাসতে আমার কান ধরে বললেনঃ ছোকরাটার কান ঠিকই শুনেছিল। আল্লাহ নিজে তা সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। (ইবনে জারীর। এ বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা তিরমিযীতেও আছে)

১৬. অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদা মূলত আল্লাহর সত্তার জন্য নির্দিষ্ট আর রসূলের মর্যাদা রিসালাতের কারণে এবং ঈমানদারদের মর্যাদা তাদের ঈমানের কারণে। এরপর থাকে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ
وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم
مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ
أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا
إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

২ রুকূ'

হে[১৭] সেই সব লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ধন–সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়।[১৮] যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ করো। সে সময় সে বলবে ঃ হে আমার রব, তুমি আমাকে আরো কিছুটা অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান করতাম এবং নেককার লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম। অথচ যখন কারো কাজের অবকাশ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় এসে যায় তখন আল্লাহ তাকে আর কোন অবকাশ মোটেই দেন না। তোমরা যা কিছু কর সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত।

কাফের, ফাসেক ও মুনাফিকদের মর্যাদার ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদায় তাদের কোন অংশ নেই।

১৭. যেসব লোক ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করেছে, তারা সত্যিকার ঈমানদার হোক বা শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিদানকারী হোক, তাদের সবাইকে সম্বোধন করে একটি উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এর আগে আমরা কয়েকবার এ কথাটি বলেছি যে, কুরআন মজীদে ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ (যারা ঈমান এনেছো) কথাটি বলে কোন সময় সাচ্চা ঈমানদারকে সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কখনো মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারাও মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকৃতি দেয়। আবার কখনো সাধারণভাবে সব শ্রেণীর মুসলমানদের সম্বোধন করা বুঝানো হয়। কোথায় কোন শ্রেণীর লোককে একথা দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে তা পরিবেশ–পরিস্থিতি ও পূর্বাপর অবস্থাই নির্দেশ করে দেয়।

১৮. বিশেষভাবে অর্থ–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততির উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ এসব স্বার্থের কারণে ঈমানের দাবী পূরণ না করে মুনাফিকী অথবা ঈমানের দুর্বলতা অথবা পাপাচার ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তবে মূলত

এখানে দুনিয়ার এমন প্রতিটি জিনিসকে বুঝানো হয়েছে যা মানুষকে এমনভাবে নিমগ্ন করে রাখে যে, সে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যায়। আর আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যাওয়াটাই সমস্ত অকল্যাণের উৎস। মানুষ যদি একথা স্মরণ রাখে যে, সে স্বাধীন নয়, বরং এক আল্লাহর বান্দা। আর সে আল্লাহ তার সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত, একদিন তাঁর সামনে হাজির হয়ে নিজের সব কাজ–কর্মের জবাবদিহি তাকে করতে হবে, তাহলে সে কখনো কোন খারাপ কাজ বা গোমরাহীতে লিপ্ত হতে পারবে না। মানবিক দুর্বলতার কারণে কোন সময় তার পদস্খলন যদি ঘটেও তাহলে সম্বিত ফিরে পাওয়ামাত্র সে সংযত ও সংশোধিত হয়ে যাবে।